কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩ ৫ কলাম ৩

এ কে এম আতিকুর রহমান ▷

কর্মমুখী ও মানসম্পন্ন শিক্ষা কেন জরুরি

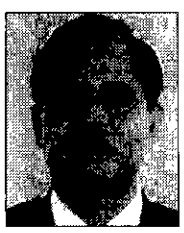

বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি স্তরে শিক্ষার্থী নেওয়া যেতে পারে এবং স্তর অনুযায়ী তাদের শিক্ষার মান নির্ধারিত হবে। তবে যে স্তরের শিক্ষার্থীই হোক না কেন, তাকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলাই হবে মুখ্য কাজ। যেমন প্রথম স্তরে যেসব শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না বা ভালো ফল করলেও অভিভাবকের আর্থিক সংগতি নেই পরবর্তী শিক্ষাব্যয় নির্বাহের, তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে ভর্তি করার ব্যবস্থা থাকবে

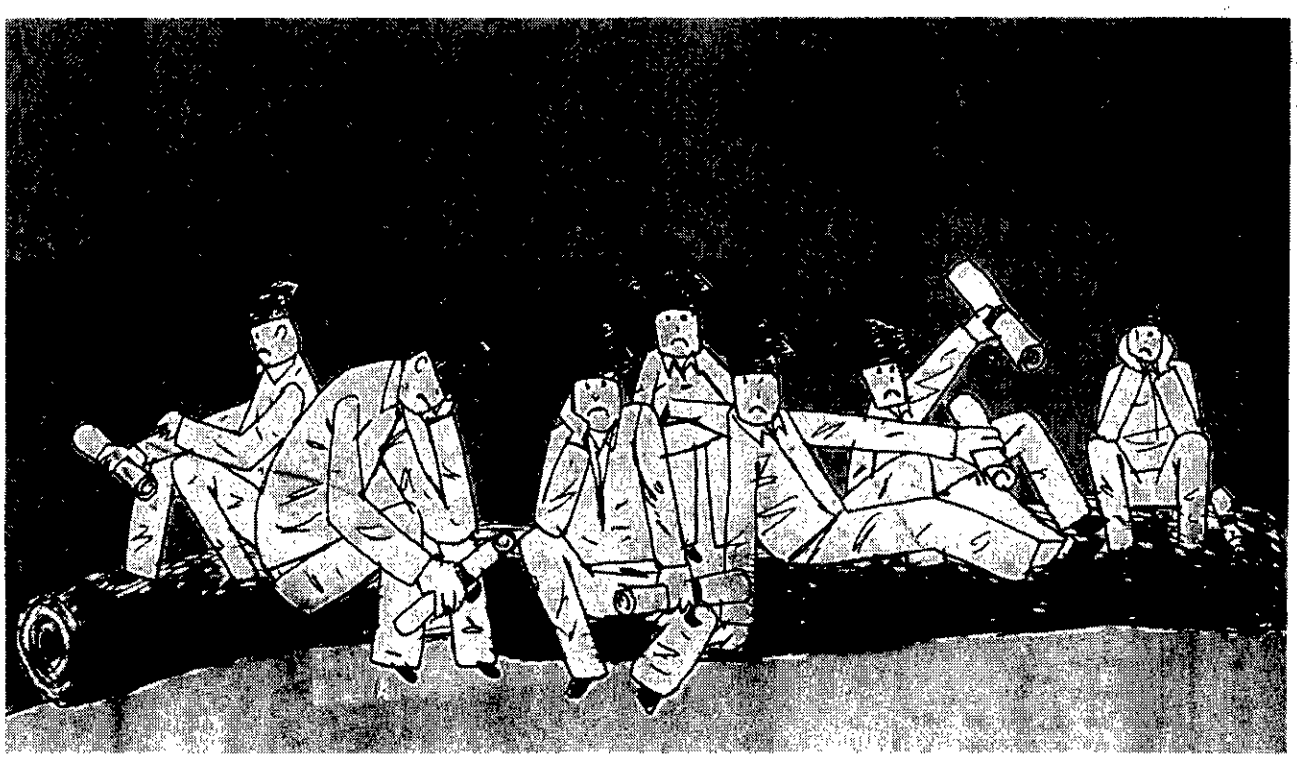

শিক্ষা কী এবং কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো হাজারো মানুষ রয়েছে। আমাদের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব না বোঝার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। শিক্ষা মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমাজ ও সভ্যতাকে জিইয়ে রাখার জিয়নকাঠি। বলতে গেলে সমাজের সব জ্ঞান ও মূল্যবোধকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আরেক নাম শিক্ষা। পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির শুরু থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বহু বছর ধরে নানা প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান বিষয়টি চলে আসছিল। অবশেষে সময়ের বিবর্তনে শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশ বিলম্বে হলেও শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটি সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করাই নয়, সব শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার প্রচলন করে। সরকারের বিদ্যমান প্রয়াসে আশা করছি, অতি শিগগিরই বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু আসলেই কি শিক্ষার হার বাড়ছে? বাড়লে কী পরিমাণে বাড়ছে? শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, না সার্টিফিকেটধারীদের সংখ্যা বাড়ছে? সার্টিফিকেট অর্জন করাই কি উদ্দেশ্য, নাকি শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শক্তি অর্জন? যে ডিগ্রি অর্জন করা হলো সেই স্তরের জ্ঞান কি সে অর্জন করেছে, নাকি অর্জিত ডিগ্রিকে দিন দিন অপমান করে যাচ্ছে? সে কি তার সার্টিফিকেট অনুযায়ী কাজ খুঁজে পাবে, নাকি আমার এই দরিদ্র দেশটির বেকার তালিকাটিই দীর্ঘতর করে যাবে? এমন আরো হাজারো রকমের প্রশ্ন নিয়ত এসে দাঁড়ায় আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনের মধ্যে। প্রথমে উত্তর দেওয়া যত সহজ ভেবেছিলাম, মূলত ততই কঠিন লিখতে বসে বুঝে গেলাম।

বাংলাদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কমবেশি সবাই অবগত আছেন। ছেলেমেয়েরা এত ভালো ফল দেখাচ্ছে। সবাই খুশিতে আত্মহারা। তবে দুর্জনেরা মাঝেমধ্যে কেমন যেন সব উল্টো কথা বলে। তা-ও আবার শিক্ষার মান নিয়ে। বিএ-এমএ পাস দিয়েও নাকি অনেকে পিয়নের চাকরি খুঁজতে খুঁজতে জুতা-স্যান্ডেল কেনার পয়সা আর জোগাড় করতে পারছে না। একটু আর্থিকভাবে ভালো থাকার আশায় যে গরিব মা-বাবা সর্বস্ব বিক্রি করে সন্তানকে বিএ পাস করালেন, সেই সন্তান যখন কোনো কাজ জোটাতে ব্যর্থ হয় তখন সেই মা-বাবার দুচোখে দারিদ্র্যের অন্ধকার চিরস্থায়ী হয়ে যায়। আমরা অবশ্যই একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী চাই। আর শিক্ষা শেষে যে চাকরি করতেই হবে এমন কথা নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মানুষকে কর্মের উপযোগী করে তৈরি করা। সে কর্ম নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠানেই হোক বা অন্য কারো প্রতিষ্ঠানে। কর্মহীনদের সংখ্যা যত কম হবে দেশের অর্থনীতি তত সচল হবে, শক্তিশালী হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হলে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম জনশক্তি তৈরি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে ধারা এরই মধ্যে চলমান রয়েছে তা নিয়ে একটু নতুনভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আমরা একান্তভাবেই চাই বাংলাদেশের সব মানুষ শিক্ষিত হোক। তবে তা যেন হয় মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত। একজন শিক্ষার্থী যে স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, তার সেই লব্ধ জ্ঞান যেন উন্নত যেকোনো দেশের ওই স্তরের সমান হয়, তবেই তো আমরা শুধু দেশেই নয় বিদেশেও আমাদের কর্ম খুঁজে নিতে পারব গৌরবের সঙ্গে। সার্টিফিকেটধারী লোকের সংখ্যা না বাড়িয়ে শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য সরকারকে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। কারণ বিদ্যমান অবকাঠামোতেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করে শিক্ষার মানকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, তাতে যদি পাস-ফেলের হারে অন্য রকম চিত্র চলে আসে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। শিক্ষাব্যবস্থা যেন আর শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি না করতে পারে সে জন্য বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় রদবদলের কথা সবাই স্বীকার করবেন।

যে কথাটি এ প্রসঙ্গে এসেই যায় তা হলো, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কতটা কর্ম বা উৎপাদনমুখী? আমাদের যে বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের কতজনের কাজের সংস্থান আমরা করতে পারছি? তাদের মধ্যে কতজনই বা তাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনায় কর্ম সৃষ্টি করতে সমর্থ হচ্ছে? আর এ ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে ওই শিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কতটুকু সাহায্য করা যাচ্ছে? সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী শিক্ষা সে লাভ করেছে কি না—সে প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে শিক্ষা সনদের অবমূল্যায়ন ও অসম্মান হলে ওই সনদ ধারণ করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। এখানে একটি ঘটনা না বলে পারছি না। আমি তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (সংস্থাপন) এবং পদাধিকারবলে মন্ত্রণালয়ের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ কমিটির সভাপতি। একদিন আমার গ্রামের এক ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে আমার মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কয়েকটি পদে যে লোক নেওয়া হবে তার একটি পদের জন্য আবেদন করেছে। সে বিএ পাস। আর চতুর্থ শ্রেণির ওই পদের জন্য আমরা চেয়েছিলাম অষ্টম শ্রেণি পাস। যেহেতু সে বিএ পাস, তাই আমি তাকে ওই পদের জন্য পরীক্ষা দিতে বারণ করেছিলাম। সে দিয়েছিল। তবে লিখিত পরীক্ষায়ই তার পাস মেলেনি।

এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বেকারত্ব আমাদের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যমান অবস্থা বিরাজ করলে ভবিষ্যতে বোঝাটি যে আকৃতি ধারণ করবে সেই ভার বহন করা আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ও একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মাত্র একটি প্রস্তাবনার উল্লেখ করব। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে শুধু যে শিক্ষিতরাই উপকৃত হবেন তা নয়, স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। এ প্রস্তাবে শিক্ষার্থীদের যেমন দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও থাকবে দুই ধরনের। তবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে পারে। অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর শিক্ষাব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে—একটি হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং অন্যটি উচ্চশিক্ষা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি স্তরে শিক্ষার্থী নেওয়া যেতে পারে এবং স্তর অনুযায়ী তাদের শিক্ষার মান নির্ধারিত হবে। তবে যে স্তরের শিক্ষার্থীই হোক না কেন, তাকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলাই হবে মুখ্য কাজ। প্রথম স্তরে যেসব শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না বা ভালো ফল করলেও অভিভাবকের আর্থিক সংগতি নেই পরবর্তী শিক্ষাব্যয় নির্বাহের, তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে ভর্তি করার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে—যেসব শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না বা আর্থিক কারণে সাধারণ শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে না, তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাবে। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে—যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না বা আর্থিকভাবে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে অক্ষম, তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য দেশে বা বিদেশে কর্মের সংস্থান করা অনেক সহজ। এ ছাড়া পারিশ্রমিকের দিক থেকে তারা সাধারণ কর্মীর চেয়ে অনেক বেশি উপার্জনে সক্ষম হয়ে থাকে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এত প্রতিষ্ঠান আমরা কোথায় পাব। এটি কোনো বড় সমস্যা নয়। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দিয়েই বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সরকার নীতিগতভাবে এ বিষয়ে আগ্রহী হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হবে না বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের মনেপ্রাণে আর কর্মে যে বিশ্বাসটি ধারণ করতে হবে তা হলো, আমরা কর্মমুখী ও মানসম্পন্ন শিক্ষিতের হার বাড়াব, সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা নয়।

খুব মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। বিশেষ করে চিকিৎসা ও প্রকৌশলসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা পড়াশোনা ও গবেষণা করবে। পড়াশোনা শেষে তারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও কাজ নিয়ে চলে যেতে পারবে। একটা কথা না বললেই নয়, আমাদের দেশে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েরই গবেষণাকাজ চালানোর সামর্থ্য নেই। আমরা জানি গবেষণা কার্যক্রম চালানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই এ ক্ষেত্রে সরকার ছাড়াও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

গত ১৭ মে 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত সৈয়দ আবুল মকসুদের 'শিক্ষা, পরীক্ষা ও রাজনীতি' লেখাটি পড়লাম। অল্প কথায় অনেক কথাই তিনি বলেছেন সুন্দরভাবে। ডা. মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ ছাত্ররা পড়াশোনা বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যা মালয়েশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য ছিল এক অশনিসংকেত। এখনো মালয়েশিয়ার কোনো ছাত্র দেশে বা বিদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তার জন্য শাস্তির বিধান বিদ্যমান রয়েছে। এই একই আশঙ্কা বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বোধ হয় খাটে। তাই শিক্ষা নিয়ে যেমন কোনো রাজনীতি করা ঠিক নয়, তেমনি শিক্ষাঙ্গনকে রাখতে হবে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত একটি পবিত্র স্থান হিসেবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য নিবেদিত থাকবে; কিন্তু শিক্ষাকে রাজনীতির সিঁড়ি বানাবে না। যে নেতৃত্ব শিক্ষিত প্রত্যেক মানুষের ভেতর শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারবে, সেই নেতৃত্ব নিজেই শিক্ষার আলোকবর্তিকা হয়ে বাংলাদেশের আপামর মানুষের হৃদয়ে অনন্তকাল প্রজ্বলিত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

সত্য অনেক সময় খুব কর্কশ লাগে, কঠিন মনে হয়। কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য, তা যতই কঠিন হোক না কেন। সত্যকে যে ভালোবাসতেই হবে। আর ওই সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে বা মেনে নিতে পারলে মিথ্যার আর আশ্রয় নিতে হয় না। ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করতে হলে বাস্তবতাকে স্বীকার করতেই হয়। একে এড়িয়ে গেলে জীবন যে হয়ে ওঠে আরো দুর্বিষহ ও অনিশ্চিত। আমাদের বোধোদয় হোক। আমরা জীবনের সত্যকে অনুধাবন করি এবং সে অনুযায়ী চলার পথটি যেন রচনা করি—এই হোক আমাদের আগামীর অঙ্গীকার।

শিক্ষা একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র সে অধিকার নিশ্চিত করবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে লেখাপড়া শিখে কেউ রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হবে, দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই পথ দেখিয়ে দিতে হবে কোন শিক্ষার্থী কোন পথে গেলে সে আর বেকার থাকবে না, রাষ্ট্রকেও তার বোঝা বইতে হবে না। আর এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব একমাত্র কর্মমুখী ও মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। এ ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। এটা স্বীকার করতেই হবে যে একজন উচ্চ ডিগ্রিধারী বেকারের চেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে সক্ষম একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে তথা দেশের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানবিক গুণসম্পন্ন ও বাংলাদেশে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ কর্মী হিসেবে গ তুলতে পারে, সে ব্যবস্থা নিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের এ নিবেদনই করছি।

লেখক : সাবেক